পর্যবেক্ষণ

সংবাদ বিশ্লেষণ ● মানবিক স্বার্থভিত্তিক প্রতিবেদন ● সমস্যাকেন্দ্রিক সংবাদ কাহিনি

পরিসেবা বন্ধ, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

তুফানগঞ্জের ঐতিহাসিক দোল মেলা। ছবি - প্রতিবেদক

জমে উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন তুফানগঞ্জের দোল মেলা

তপন আইচ ● বক্সিরহাট

হাজার হাজার মানুষের মিলনে জমে উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন তুফানগঞ্জের দোল মেলা। তুফানগঞ্জ মদনমোহন মন্দিরের দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে গত বুধবার তুফানগঞ্জ রায়ডাক নদীর চরে এ মেলার উদ্‌বোধন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মেলা চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। এ বছর মেলা ১২১ বছরে পদার্পণ করল বলে দোল মেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। প্রতিদিন বিকেল ৪টার পর থেকে লোকসমাগম শুরু হয়। রাত ১১টা পর্যন্ত মেলা জমজমাট থাকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় মেলায় কোনো মাইক ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্রতিদিন অসম সহ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গড়ে ৩৫-৪০ হাজার মানুষ সমবেত হন বলে জানা গেছে। এবারের মেলায় এসেছে বড়ো সার্কাস, ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় ২০টির মতো নাগোরদোলা, ট্রয়ট্রেন, ভূতবাংলো, গঙ্গাযমুনা। রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চারশতাধিক দোকানপাট। এ মেলার বিশেষ আকর্ষণ জিলিপি। মেলায় সর্বাধিক এই মিষ্টিটিই বেশি বিক্রয় হয় বলে মেলা কমিটি দাবি করেছেন।

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত গিরিধারী গোপীবল্লভ মন্দিরের বিগ্রহকে দোল পূর্ণিমার দিন মেলা প্রাঙ্গণে আনা হয়। পঞ্চম দোল পর্যন্ত ওই বিগ্রহকে মেলা মন্দিরে রাখা হয়। ওই পাঁচদিন সেখানে পুজোপার্বণ চলে। তাকে কেন্দ্র করেই এই মেলা হলেও মেলাকে পরিচালনা করতে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ধর্মীয়বর্গ ও সম্প্রদায়ের মানুষও। ৭৭ জনকে নিয়ে যে মেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে তার মধ্যে ১১ জন সদস্যই মুসলিম সম্প্রদায়ের, তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চূড়ান্ত নিদর্শন তৈরি করেছে এ মেলা। সিপিএম পরিচালিত তুফানগঞ্জ পুরসভা, এ মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন তৃণমূল পরিচালিত তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতি এবং নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চম দোল পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিবছরের মত এবারও অনুষ্ঠিত হয়েছে বাউল গান, কবি গানের আসর। হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। লোক সংস্কৃতি গবেষক ডঃ দিলীপ দে-র প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে জানা গেছে, ১৮৯২ সনের ১৫ জুন মহকুমা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এ মেলার সূচনা। পূর্বে এর নাম ছিল 'ফুলবাড়ি দোল মেলা'। শুরুতে এ মেলা ৭ দিনের হলেও পরে তা ১৫ দিনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮০ সালের পর থেকে রায়ডাক নদীর চরে কামাতফুলবাড়ি মৌজায় ২২ বিঘা জমির উপর মেলা বসে। একদা জেলার অন্যতম এই মেলায় বাংলাদেশ, অসম, ভুটানের বিভিন্ন এলাকা থেকে পণ্য নিয়ে হাজির হতেন ব্যবসায়ীগণ। এই মেলায় বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে গোরু, ঘোড়াও ছিল। প্রজাদের অভাব অনটন দূর করতে কৃষিকর্মে ব্যবহৃত দ্রব্যও আমদানি হত মেলায়। তবে বর্তমানে প্রতিবেশী দেশের ব্যবসায়ীরা না এলেও কলেবরে আধুনিকতায় তা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অটুট রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও। গ্রামের মানুষ ফসল ঘরে তুলে হাতের বাড়তি দু-চার পয়সা খরচ করার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন এ মেলার জন্য।

কিশনগঞ্জ মডেল থানা। ছবি - শুভজিৎ জোয়ারদার

বিহারের মডেল থানা প্রকল্প নানা কারণে অসফল

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার ● কিশনগঞ্জ

বিহারের মডেল বা আদর্শ থানা প্রকল্প নানা কারণে অসফল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। কারণ রাজ্যে আদর্শ থানা নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে থানাগুলির কম্পিউটারাইজ প্রকল্প অসফল কেননা, ২০০৮ সালে রাজ্যের পুলিশ থানাগুলিকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনার জন্য সীপা প্রজেক্ট বা কমন ইনটিগ্রেটেড পুলিশ অ্যাপলিকেশন প্রজেক্ট শুরু হয়। রাজ্যের প্রকল্পে থানাগুলিকে একটি সফটওয়্যারের মধ্যে আনার চেষ্টা শুরু হয়। যদি সীপা প্রজেক্ট সফল হত, তবে রাজ্যের যে কোনো থানায় নথিবদ্ধ এফআইআর, চার্জশিট, ক্রাইম ডাটা কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করলে জানা যেত। ২০০৭-০৮ সালে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মঞ্জুর করে রাজ্য সরকার। ৭টি থানা কিশনগঞ্জ, কোচাধামন, ঠাকুরগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, টেরাগছ, দ্বিঘল ব্যাংক, পোঠিয়ার জন্য কম্পিউটার কেনা হয়নি। কিন্তু কম্পিউটারগুলি আজ থানাগুলিতে শুধুমাত্র নথিপত্রে স্বীকৃত।

শুধু কি কম্পিউটার। ২০০৫ সালে সীপা প্রজেক্টের আগে থানাগুলিকে ওয়্যারলেসের ব্যাটারি সেট চার্জ করার জন্য ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের কেরোসিন জেনারেটার দেওয়া হয়। কিন্তু কেরোসিন জেনারেটার সেট দেওয়া হলেও কেরোসিন তেল কেনার টাকা বরাদ্দ হয়নি। আর এর ফলে মডেল থানার জন্য সীপা ও কেরোসিন জেনারেটার প্রকল্প দুইটিই বিফল।

কিন্তু জেলার মডেল থানাগুলির জন্য সম্প্রতি সুরম্য ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আর সম্প্রতি আশার বাণী শুনিয়েছেন রাজ্যের ডিজিপি অভয়ানন্দ। ডিজিপি-র বক্তব্য রাজ্যের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য থানাগুলিকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় আনা হবে।

বিডিআর-এর আতঙ্ক কাটেনি কলসিগ্রামে

গৌতম সরকার ● চ্যাংরাবান্ধা

কাঁটাতারের বেড়াবন্দি কলসিগ্রামে ঢোকার গেট বন্ধ। (ডানে) বিডিআর-এর গুলিতে নিহত জসিমুদ্দিনের দুই পুত্র। ছবি - প্রতিবেদক

মাটির কাজের কথা শুনলেই আজও কোচবিহার জেলার কলসিগ্রামের বাসিন্দাদের বুক আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। সীমান্তবর্তী এই এলাকায় ভয়ে এখনও এই ধরনের কাজে হাত লাগাতেও সাহস পাননা অনেকে। কারণ তাদের আশঙ্কা, সীমান্তের নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগ এনে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানেরা যদি তেড়ে আসেন তাহলে তো সর্বনাশও হয়ে যেতে পারে। কারণ বছর ছয়েক আগে ওরাইতো হঠাৎ গুলি চালিয়ে দুইজন ভারতবাসীকে মেরে ফেলেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৬ সালের ২৮ মার্চ। তারপর থেকেই প্রতিবছর এই মার্চ মাস শুরু হলেই সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায় অনেকের। ভয়ে অনেকে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে চান। কিন্তু আর্থিক কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন। যদিও বিএসএফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন অযথা আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। সীমান্তে সর্বদা বিএসএফএর কড়া নজরদারি জারি রয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৬ সালের ২৮ মার্চ কলসিগ্রামে সরকারি প্রকল্পের অধীনে মাটির রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। উল্লেখ্য, কলসিগ্রামের প্রায় চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। যেখানে মাটির কাজ করছিলেন গ্রামের শ্রমিকেরা, সেখান থেকে কিছুটা দূরেই বাংলাদেশ। কাজ চলাকালীন ভারতীয় গ্রামবাসীদের লক্ষ করে তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর জওয়ানেরা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই মহম্মদ মংলু এবং জসিমুদ্দিন নামে দুইজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। এছাড়াও আহত হন বেশ কয়েকজন। বাংলাদেশের তরফে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সীমান্তের ১৫০ মিটারের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ঘটনার পরেই কলসিগ্রাম পরিদর্শনে আসেন বিএসএফএর তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল এ কে মিত্র সহ প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চকর্তারা। তারা গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বাসও দিয়ে যান। যার পরিপ্রেক্ষিতেই কলসিগ্রামের ভিতরে তৈরি করা হয় নতুন একটি সীমান্ত চৌকি অর্থাৎ বিএসএফ ক্যাম্প। বৃদ্ধি করা হয়েছে জওয়ানদের প্রহরা ব্যবস্থাও, কিন্তু তাসত্ত্বেও আতঙ্ক কাটেনি কলসিগ্রামের মানুষের মনে। বাংলাদেশ রাইফেলস বাহিনীর কথা উঠতেই ভয়ে কেঁপে উঠলেন ২০০৬ সালে মৃত জসিমুদ্দিনের ছোট্ট দুইপুত্র রাসেল ও আবেদার। ওরা জানায়, অনেকের মুখেই শুনেছি বাংলাদেশের বিডিআর ওইদিন আমাদের দেশের মানুষদের লক্ষ করে অনেক গুলি চালিয়েছিল। যার কারণে আমার বাবাকেও মরতে হয়েছে। তাই বিডিআরের কথা বললেই আমাদের এখনও ভয় হয়। মৃত মহম্মদ মংলুর পুত্র রেজ্জাকুল জানান, বাংলাদেশের বিডিআরই তো আমাদের পরিবারের সর্বনাশ ঘটিয়েছে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আমার পিতারও। তাই ওদের কথা শুনলে মনে ভয় তো হবেই। জানা গেছে, ওইদিন বিডিআরের গুলির শব্দ শুনে ঘটনাস্থল থেকে ভয়ে পালিয়ে যে যেখানে পেরেছেন লুকিয়ে পড়েছিলেন। তা নাহলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারত বলেও অনেকে মনে করছেন। বিডিআরের গুলিতে মৃতের পরিবারগুলিকে প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য করা হয়েছিল। এছাড়াও এখানে সীমান্ত চৌকি তৈরি করা হয়েছে। গ্রামে ঢোকার মুখে সামিয়াজান নদীর উপর গড়া হয়েছে স্থায়ী একটি পাকা সেতুও। তাসত্ত্বেও পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট নন কলসিগ্রামের মানুষ। তারা জানিয়েছেন সেতু তৈরি হলেও সেতুর সঙ্গে যুক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। গ্রামের ঢোকার মাটির রাস্তার কাজ করা হয়েছিল ২০০৬ সালে, পরবর্তীতে এখানে রাস্তার কোনও কাজ হয়নি। শুকনো মরশুমে ধুলোবালির জন্য যেমন রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যা হচ্ছে তেমনি বর্ষাকালে কাদার জন্য চলাফেরা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই গ্রামে ঢোকার একমাত্র রাস্তাটি পাকা করার দাবিও করেছেন এলাকাবাসী। রাস্তাটি পাকা হলে শুধু গ্রামবাসীরাই নন উপকৃত হবেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীরাও। কারণ এই পথে তাদের ও চলাচল করতে হয়। সম্প্রতি কলসিগ্রাম পরিদর্শন করতে এসেছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক মোহন গান্ধিও। গ্রামবাসীরা জেলাশাসককে সামনে পেয়ে নদীভাঙনরোধ, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ সহ বিভিন্ন দাবির কথা তুলে ধরেন। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় আশ্বাসও মেলে। তবে কবে নাগাদ পুরো সমস্যার সমাধান হবে এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সীমান্তপাড়ের কলসীগ্রামের মানুষেরা।

জাল নোটের রমরমা কারবারে চ্যাংরাবান্ধার মানুষ আতঙ্কিত

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

চ্যাংরাবান্ধা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবিশ্বাস্যভাবে ভারতীয় পাঁচশো টাকা ও হাজার টাকার জাল নোটের কারবারে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে স্থানীয় জনসাধারণ আর ৫০০ টাকার নোট নিতে চাইছেন না। জাল টাকা নিয়ে উদ্‌বেগ এতটাই যে আসল পাঁচশো টাকার নোট হাতে নিয়েও জনগণ ভাবছেন এই টাকা আসল কিনা। এই সব জাল টাকা চ্যাংরাবান্ধা থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তরবঙ্গে ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। চ্যাংরাবান্ধায় ব্যাংকে অনেকে তাদের টাকা জমা দিতে গেলে কাউন্টারের ব্যাংক কর্মীর কাছ থেকে জানতে পারেন তাদের জমা দেওয়া পাঁচশো টাকার নোট আসল নয়। ব্যাংক থেকে জাল নোটগুলোর ওপরে লাল কালি দিয়ে নোটগুলি বাতিল বলে লিখে দিচ্ছেন ব্যাংক কর্মীরা। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ তাদের ধান, পাট সহ অন্যান্য ফসল মহাজনদের কাছে বিক্রি করে নগদ টাকা পান। এই সমস্ত টাকার মধ্যে পাচশো টাকা, এক হাজার টাকার নোটও থাকছে। হাজার টাকার জাল নোটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও পাঁচশো টাকার জাল নোটের সংখ্যাই বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরাও বুঝতে পারেন না টাকা আসল না নকল। এর পাশাপাশি এখানে অবাধে চলছে ভুটানের নোট। ফলে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। জাল টাকা নিয়ে পুলিশের কাছে যেতেও ভয় পাচ্ছেন তারা।

অনেক ক্ষেত্রেই খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার সচেতনতার অভাবে এই জাল নোট বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা, জাল টাকার কারবারিরা সুকৌশলে আসল নোটের সঙ্গে জাল নোট মিশিয়ে বাজারে ছাড়ার ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকেও ইতিমধ্যেই দেশের জনগণকে পাঁচশো টাকার জাল নোটের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জাল টাকা চেনার ব্যাপারে জনসচেতনতার অভাব থাকায়। সীমান্তের ওপার বাংলাদেশ থেকে জাল টাকার কারবারিরা এই জাল নোট দালালদের মাধ্যমে এপারে নানা কৌশলে ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের ধারণা। বিএসএফের জনৈক পদস্থ আধিকারিক কথা প্রসঙ্গে বলেন, পাঁচশো টাকার জাল নোট চেনার জন্য গ্রামে গ্রামে সচেতনতা শিবির করার প্রয়োজন রয়েছে। ওই আধিকারিক জানান, সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে তারাও সচেতনতা শিবির করে জাল নোটের বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করার কর্মসূচি নিচ্ছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবার জন্য কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে ।

অসচেতন একশ্রেণির বাসিন্দা

কোচবিহারে বাড়ছে দূষণ সহ নানা সমস্যা, ব্যবস্থা নেবে পুরসভা

দেবাশিস ভৌমিক ● কোচবিহার

কোচবিহার শহরের রাজেন্দ্র রোডে ইট, বালির স্তূপ। ছবি - মানিক বণিক

একসময় যে শহরকে 'সিটি অব বিউটি' বলা হত আজ সেখানে পুর পরিসেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শহরের জমে থাকা জঞ্জাল, ড্রেন সাফাই, রাস্তাঘাটজুড়ে পড়ে থাকে হরেক রকম নির্মাণ সামগ্রী এবং প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। এসব নিয়ে বিস্তর অভিযোগ করেছেন শহরের বাসিন্দারা। পুরসভা এইসব সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করলেও একশ্রেণির মানুষের সচেতনতার অভাবে এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘর-গেরস্থালির আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পুরসভা একটি এজেন্সি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। মাসে পনেরো টাকার বিনিময়ে বাড়ি থেকে আবর্জনা নিয়ে যান তারা। তবুও বহু মানুষ এখনও রাস্তার ধারে জঞ্জাল, আবর্জনা ফেলে নোংরা করেন। বাড়ির আনন্দ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত কাগজের প্লেট, প্লাস্টিকের বাটি বা গ্লাস গড়াগড়ি যায় রাস্তাজুড়ে। হাওয়ায় উড়ে সেসব গিয়ে জমা হয় জলনিকাশি নালায়। আবার কেউ কেউ সরাসরি নালাতেই সবকিছু ছুড়ে ফেলে বাড়ি পরিষ্কার রাখার কর্তব্য সারেন। এসবের ফলে নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। জমা জলে মশার বংশবৃদ্ধি হয় আর শেষমেশ পুরসভার ঘাড়েই দোষ চাপে ড্রেন পরিষ্কার করা হয় না বলে। শহরে যারা নতুন বাড়ি করছেন তারা অনেকেই নির্মাণ সামগ্রী রাস্তাজুড়ে ফেলে রাখেন। পথচারীদের কথা বা যানবাহন চলাচলের কথা তারা মনেই রাখেন না। এর ফলে ছোটোখাটো দুর্ঘটনাও যে হয় না, তা নয়। পুরসভা বিজ্ঞাপন দিয়ে মাইকে প্রচার করেও তাদের হুঁশ ফেরাতে পারেনি বলে অভিযোগ।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান বীরেন কুণ্ডু বলেন, তারা নানাভাবে নাগরিকদের সচেতন করার চেষ্টা করছেন, তবু অনেকে নিয়ম-কানুন মানছেন না। নাগরিক জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে যারা ড্রেনে ময়লা ফেলেন, রাস্তায় আবর্জনা ছোড়েন, চলাচলের পথ আটকে বালি-পাথরের স্তূপ বানান তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর পথ নেই বলে জানান তিনি। এছাড়া যারা পুরসভার অনুমতি ছাড়া বাড়িতে অবৈধ জলের সংযোগ নিয়েছেন এবং যারা সরাসরি পাইপলাইন থেকে মোটরচালিত পাম্প দিয়ে জল টেনে নিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন চেয়ারম্যান বীরেনবাবু।

এসব ছাড়াও আধুনিক জীবনযাত্রায় শহরে যোগ হয়েছে আরেক সমস্যা। প্লাস্টিক দূষণ। অবাধে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ। এরপর তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে নালায় নর্দমায় যত্রতত্র এবং পরবর্তীতে নর্দমায় জল জমার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতেও পুরসভার পক্ষ থেকে অনেকবার হুঁশিয়ারি জারি করা হয়েছে। যখন একটানা অভিযান চলে, বাজারে-দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতারা জরিমানার মুখে পড়েন তখন কিছুদিন ক্যারিব্যাগ ব্যবহার কম থাকে। তারপর আস্তে আস্তে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ খেদের সুরে বলেন, তারা বহুবার শহরবাসীকে সচেতন করেছেন, পুরকর্মীরা অভিযান চালিয়েছেন, জরিমানা আদায় করেছেন তবু ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। শুধু সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে কিছু হবে না। এবার একটু কড়া হাতে মোকাবিলা করা দরকার বলে জানান তিনি।

১০০ দিনের কাজ নিয়ে রাজ্যে প্রথম অডিট মেটেলিতে

রহিদুল ইসলাম ● মেটেলি

ডাঙ্গাপাড়া স্কুল মাঠে সামাজিক নিরীক্ষা ও গণশুনানি বিষয়ক সভা চলছে। ছবি - প্রতিবেদক

১০০ দিনের কাজে স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে রাজ্যের মধ্যে প্রথম মেটেলির বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে করা হল সোশ্যাল অডিট বা সামাজিক নিরীক্ষা। পরীক্ষামূলকভাবে এই অডিট করা হয়। এই কাজের অডিট বা সামাজিক নিরীক্ষা আগে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতই করত। ফলে ওই অডিটের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যেত। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 'M.G.N.R.E.G. Audit of Scheme Rule 2011' নামে একটি নতুন নিয়ম তৈরি করে। তাতে পরীক্ষামূলকভাবে সামাজিক নিরীক্ষার কথা বলা হয়। দেশের কোন কোন রাজ্যে এই অডিট করা হবে তা কেন্দ্রই ঠিক করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বীরভূম, হুগলি ও জলপাইগুড়ি জেলাকে বেছে নেওয়া হয় নিরীক্ষার জন্য। জলপাইগুড়ি জেলার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই নিরীক্ষা হয়। সামাজিক নিরীক্ষা ও অভিযোগ নিরসন বিভাগের জলপাইগুড়ি জেলার কোঅর্ডিনেটর সুদীপ ভদ্র বলেন, অডিটের জন্য জানুয়ারি মাসে জেলা প্রতিনিধিদের অন্ধ্রপ্রদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মূলত পরীক্ষামূলকভাবে এই অডিট করা হবে। অডিটের তিন জেলার রিপোর্ট রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হবে। সেখান থেকে যেটি উন্নতমানের তাকেই রাজ্যে মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজ্যের প্রথম এই অডিট করা হয়। ১২ থেকে ১৬ মার্চ এই পাঁচদিন অডিট সংক্রান্ত কাজ হয়। অডিটের জন্য নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরে থেকে পাঁচজন যুবককে প্রথমে নিয়োগ করা হয়। তারপর তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অডিটের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮/১৪০ নং সংসদের সাহেদার রহমানের পুকুর সংস্কারের কাজকে। ১৩ ও ১৪ মার্চ ওই কাজে যুক্ত শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যুবকরা আটটি বিষয়ের ওপরে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। ১০০ দিনের কাজের প্রচার, নিবন্ধীকরণ, জবকার্ড, কাজের আবেদন, বণ্টন, মজুরি প্রদান, কর্মসূচির রূপায়ণ ও অভিযোগ—এইসব বিষয়ের ওপরে শ্রমিকদের বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৬ মার্চ মাথাচুলকা ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ওই রিপোর্টকে নিয়ে এলাকার জনগণ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন, বিডিও, জেলাশাসকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গণশুনানি ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে ওই যুবকদের দ্বারা সংগৃহীত রিপোর্ট বা প্রতিবেদনটি সকলের সামনে পাঠ করা হয়। রিপোর্টে কোনো তথ্য ভুল আছে কিনা তা সকলের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ওইদিন প্রশাসনের সামনেই জনগণ তাদের ক্ষোভ উগরে দেন। রিপোর্টের ওপরে আলোচনার পর শেষে একটি সর্বসম্মতি চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং সেই রিপোর্টটিই রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হবে। ওইদিনের গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন মেটেলির জয়েন্ট বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্য, এসজিএনআরজিএসের (হেড কোয়ার্টার) জেলার জয়েন্ট বিডিও তথা জেলাশাসকের প্রতিনিধি থিন্ডুপ ভুটিয়া, বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শান্তি কেরকেট্টা সহ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্লক কর্মীরা। থিন্ডুপ ভুটিয়া বলেন, ১০০ দিনের কাজে স্বচ্ছতা, জনগণের সচেতনতা ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিই এর মূল উদ্দেশ্য। চূড়ান্ত যে রিপোর্ট করা হয়েছে তা জেলাশাসককে দেওয়া হবে। পরীক্ষামূলকভাবেই এই অডিট হল। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এই অডিট শুরু হয়নি। তাই রাজ্যের মধ্যে প্রথম এই অডিট হল এখানে।

সংশোধনী

গতকাল উত্তরবঙ্গ সংবাদের পর্যবেক্ষণ পাতায় প্রকাশিত 'চাঁচলের বন্ধ ডিপোয় পাঁচটি বাস' শীর্ষক প্রতিবেদনটি মোস্তাক মোরশেদ হোসেনের নয়, মহম্মদ মরতুজ আলমের লেখা। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।